بسم الله الرحمن الرحیم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ মোতাবেক ২৫ তাবুক, ১৪০৫ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

বিগত কয়েকটি খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনী নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমি তাওয়াক্কুল বা খোদানির্ভরতার সর্বোচ্চ মান সম্পর্কে বর্ণনা করে আসছিলাম। বর্তমান যুগে তাঁর (সা.) সত্যনিষ্ঠ দাস তাঁরই (সা.) আদর্শ অনুযায়ী সেটিকে আমাদের জন্য কীভাবে বর্ণনা করেছেন, কী শিক্ষা দিয়েছেন এবং এর ওপর কীভাবে আমল করেছেন, সে সম্পর্কে আজ আমি কিছু কথা বলব।

হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, তাওয়াক্কুল হলো কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য আল্লাহ তা'লা যে সকল উপায়-উপকরণ নির্ধারণ করে রেখেছেন, সাধ্যমতো সেগুলো জড়ো করা। এরপর নিজে এই বলে দোয়ায় রত হওয়া যে, হে খোদা! তুমিই এর পরিণাম শুভ করো। শত শত বিপদ-আপদ ও হাজারো সমস্যা রয়েছে, যা এসব উপায়-উপকরণ ধ্বংস বা নস্যাৎ করে দিতে পারে। এসবের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করে আমাদেরকে প্রকৃত সাফল্য ও গন্তব্যে পৌঁছে দাও।

মানুষ উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে ঠিকই, কিন্তু এমন অনেক বিপদ-আপদ রয়েছে বা এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে পারে, যার ফলে আমাদের অবলম্বিত উপায়-উপকরণগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। এ কারণে আল্লাহ তা'লার কাছে সাহায্য চাওয়া উচিত, যেন তিনি আমাদেরকে এগুলোর কুপ্রভাব থেকে রক্ষা করেন। এটি হলো সেই অবস্থা, যা অবলম্বন করে একজন মুমিন আল্লাহ তা'লার কৃপাভাজন হতে পারে।

হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহ তা'লার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা সবার পক্ষে সম্ভব নয়; বরং এটি হলো তাওয়াক্কুল (খোদা নির্ভরতা) ও তাবাত্তুল– অর্থাৎ খোদার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ, আল্লাহর ইচ্ছায় সন্তুষ্ট থাকা ও আত্মসমর্পণের এমন এক উচ্চ স্তর, যেখানে পৌঁছার পর মানুষের মনে নিজ প্রভুর প্রতি কোনো ধরনের অনুযোগ বা অভিযোগ থাকে না। বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্ট হওয়া নির্ভর করে বান্দার পূর্ণ নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা এবং সর্বোচ্চ স্তরের পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও পূর্ণ আনুগত্যের ওপর। যা থেকে বোঝা যায় যে, সাহাবীরা (রা.) মারেফাত তথা তত্ত্বজ্ঞান ও সুলুক তথা আধ্যাত্মিকতার পথে বিচরণের সকল স্তর অতিক্রম করেছিলেন। আর তারা আল্লাহ তা'লার সাথে সম্পর্ক ও তাওয়াক্কুলের এমন এক মর্যাদা লাভ করেছিলেন, যাকে আমাদের জন্য আদর্শ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

যারা হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারী, তারা বলে যে, তিনি রোগীদের আরোগ্য দান করতেন। কিন্তু তিনি (আ.) প্রশ্ন তুলেছেন যে, এতে কি হাওয়ারীদের মাঝে খোদা তা'লার প্রতি তাওয়াক্কুল বেড়ে গিয়েছিল? তাওয়াক্কুল দৃঢ় হওয়া তো আল্লাহ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে হয়ে থাকে, যদি তাঁর প্রতি পূর্ণ মনোযোগ থাকে। এই তাওয়াক্কুলের নমুনা হাওয়ারীদের মাঝে খুঁজলে তা কখনোই পাওয়া যাবে না।

সুতরাং, কেবল রোগ-ব্যাধি দূর করার মাধ্যমে বিশেষ কিছু অর্জিত হয় না। সূফীদের সম্পর্কেও লেখা আছে যে, তারাও আরোগ্য প্রদানের এই মুজিযা দেখিয়ে থাকেন। এতেই আনন্দিত হয়ে যাওয়া কোনো বুদ্ধিমত্তার কাজ নয় আর আধ্যাত্মিক পূর্ণতা অন্বেষণকারীরা কেবল এসব কথায় সন্তুষ্ট হতে পারে না।

তাই আমি তোমাদের জন্য এটাই পছন্দ করি যে, তোমরা নিজেদের অন্তরকে পবিত্র করো এবং খোদার সাথে এমন সম্পর্ক স্থাপন করো, যেন সেই দয়াময় প্রভু তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং তোমরা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। তখন তিনি তোমাদের সত্তায় ও কথায় এমন কল্যাণ রেখে দেবেন, যা দেখে রোগ-ব্যাধি নিরাময়কারীরাও অবাক ও লজ্জিত হবে। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'লার সাথে তোমাদের সম্পর্ক যদি এতটা সুদৃঢ় হয়, তবে যারা নিছক রোগীদের আরোগ্য দান করে, তারা তোমাদের এই আধ্যাত্মিক মর্যাদা দেখে নিজেরাই লজ্জিত হবে। সুতরাং, একজন মুমিন যদি আল্লাহ তা'লায় তাওয়াক্কুল করে এবং তাঁর সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করে, তবে সে নিজেও মুজিযা দেখানোর যোগ্য হতে পারে।

এরপর অন্য এক স্থানে তাওয়াক্কুল (খোদা ভরসা) ও তাবাত্তুল (সবাইকে ছেড়ে খোদামুখী হওয়া) এর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, এটিও মনে রেখো যে, বিপদ-আপদরূপী ক্ষত নিরাময়ের জন্য এমন প্রশান্তিদায়ক ও আরামদায়ক কোনো মলম নেই, যতটা আল্লাহ তা'লার ওপর ভরসা করা। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'লার ওপর ভরসা করে, সে কঠিন থেকে কঠিনতর সমস্যা ও বিপদ-আপদের মাঝেও হৃদয়ে সান্ত্বনা ও প্রশান্তি বোধ করে। সে নিজ অন্তরে কোনো তিক্ততা ও কষ্ট অনুভব করে না। যদি তা তকদিরে মুবরাম তথা অনড় তকদীর হয়ে থাকে তাহলে বড়োজোর মৃত্যু হতে পারে। মুমিনের জীবনে বিপদ-আপদ আসে, কিন্তু খোদা তা'লার প্রতি ঈমান দৃঢ় থাকলে সে তা নিজের মাথায় চাপিয়ে নেয় না। সর্বোচ্চ কী হবে? মৃত্যু? তাতে কী-ই বা যায় আসে! পৃথিবী চিরকাল থাকার জায়গা নয়। পরিশেষে সবার জীবনেই এমন এক দিন ও সময় আসবে, যখন এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে। তাই যদি তার মৃত্যু এসেই যায়, তবে ক্ষতি কী? মুমিনের জন্য তো এই মৃত্যু আরও বেশি আরামদায়ক এবং পরম বন্ধুর সাথে মিলনের মাধ্যম হয়ে যায়। যদি সে প্রকৃত মুমিন হয় এবং আল্লাহ তা'লার প্রতি তার ঈমান দৃঢ় থাকে, তখন সে তো বলে যে, বেশ, খোদা তা'লার সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যাবে! কারণ সে আল্লাহ তা'লার ওপর পূর্ণ ঈমান রাখে এবং তাঁর পবিত্র শক্তিমত্তার ওপর নির্ভর করে, আর সে জানে যে, পরকাল তার জন্য চিরস্থায়ী আরামের স্থান।

সুতরাং, নিছক বিপদ-আপদ–তা অসুস্থতা হোক বা অন্য কোনো ধরনের কষ্ট–তা কখনো আযাবের কারণ হতে পারে না। বরং সেই বিপদ-আপদই কষ্টদায়ক আযাবে পর্যবসিত হয় যখন আল্লাহ তা'লার প্রতি ঈমান ও ভরসা থাকে না। মুমিনের জীবনে মুসিবত এলেও তা তার জন্য আযাব হয় না। আযাব তো কেবল তখনই হয় যখন আল্লাহ তা'লায় ঈমান ও ভরসা থাকে না। যার ঈমান নেই এমন ব্যক্তির জন্য সেটি কঠোর আযাব হয়ে থাকে। আর কেউ যদি চায় যে, মৃত্যুই যেন না আসে, তবে এটি সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অলীক ধারণা; কারণ আল্লাহ তা'লা এই জগৎকে ক্ষণস্থায়ী আখ্যায়িত করেছেন। এমন ঈমানহীন ব্যক্তির জন্য পরকালে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক জাহান্নাম অপেক্ষা করছে, যার জন্য তার প্রস্তুত থাকা উচিত। সুতরাং, যারা এ কথা জিজ্ঞেস করে যে, আমরা কীভাবে বুঝব যে, এই সমস্যা বা কষ্ট আযাব নাকি আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে পরীক্ষা?–উপরোক্ত আলোচনা তাদের প্রশ্নেরও একটি চমৎকার উত্তর।

তিনি (আ.) সুযোগ ও সময় অনুযায়ী নিজ অনুসারীদেরকে তাওয়াক্কুল (খোদা নির্ভরতা)- সম্পর্কে উপদেশ দিতেন। অতএব একটি রেওয়ায়েতে হযরত মাস্টার নযীর হুসাইন সাহেব বলেন যে, হযরত আকদাস (আ.) বলেছেন, এ কথা মনে করো না যে, আল্লাহ তা'লা দুর্বল; তিনি মহাশক্তিমান। যখন কোনো বিষয়ে তাঁর ওপর নির্ভর করবে, তখন তিনি অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করবেন। যেমনটি তিনি নিজেই বলেছেন: وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (সূরা আত্-তালাক, ৬৫:৪) অর্থাৎ, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট।

পুণ্যবান লোকদের গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন: একটি পদমর্যাদা বা পর্যায় হলো তাওয়াক্কুলের স্তর, যাতে তাদেরকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তারা ছাড়া অন্য কেউ কখনোই সেই স্বচ্ছ প্রস্রবণের সুধা লাভ করতে পারে না; বরং কেবল তাদের জন্যই একে সুখঃকর ও অনুকূল করা হয়। আর মারেফাত বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলো তাদেরকে এমনভাবে আগলে রাখে যে, অনেক সময় তারা চরম নিঃস্ব অবস্থায় থেকেও এবং জাগতিক উপায়-উপকরণ থেকে সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত হয়েও এমন প্রফুল্লতা ও মানসিক প্রশান্তির মাঝে জীবনযাপন করে আর এমন সুখে দিন কাটায় আর যে, দেখলে মনে হয় তাদের কাছে হাজারো ধনভাণ্ডার রয়েছে। যে-সব সুযোগ-সুবিধায় তারা অভ্যস্ত ছিল, সেগুলো হাতের নাগালে না থাকলেও যাদের আল্লাহ তা'লার ওপর তাওয়াক্কুল রয়েছে, তারা পরম তৃপ্তি ও আনন্দের মাঝে জীবন অতিবাহিত করে; যেন তারা অশেষ সম্পদের অধিকারী। তাদের চেহারায় আর্থিক সচ্ছলতার বা ধনাঢ্য হবার ছাপ দেখা যায় এবং সম্পদশালী মানুষের অচিলতা পরিলক্ষিত হয়। আর অভাব-অনটনের মাঝেও পরম উদার মন ও সুদৃঢ় বিশ্বাসের সাথে (তারা) নিজেদের পরম দয়ালু প্রভুর ওপর ভরসা রাখেন। আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক থাকলে সংকট এবং কষ্ট-ক্লেশের মাঝেও তারা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভরসা রাখেন, তাঁর থেকে দূরে সরে যান না। তাদের মনে এমন ভাবনা আসে না যে জানি না এটি কী বা এটি কোত্থেকে এলো; (এটি কি কোনো) বিপদ, পরীক্ষা নাকি শাস্তি। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি যদি পূর্ণ তাওয়াক্কুল থাকে এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য অধিকারগুলো যদি প্রদান করে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় কৃপারাজিতে ভূষিত করেন। তিনি (আ.) বলেন, খোদার ওপর নির্ভরকারী এবং খোদার প্রতি বিনত ব্যক্তিরা কখনো ধ্বংসপ্রাপ্ত হন না। যে ব্যক্তি কেবল নিজের চেষ্টাতেই সীমাবদ্ধ থাকে, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ব্যতীত তার আর কী-ই বা জুটতে পারে! সৃষ্টির সূচনা থেকে সর্বদা আল্লাহ্‌র রীতি হচ্ছে, যারা জগৎকে ছেড়ে দেয়, তারা তা লাভ করে; আর যারা এর পেছনে ছোটে, তারা এটি থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। খোদা তা'লার সাথে যারা সম্পর্ক রাখে না, তারা যদি কয়েকদিনের জন্য ছল-চাতুরির মাধ্যমে কিছু অর্জন করেও নেয়, তবে তা একেবারেই অর্থহীন। জাগতিক স্বার্থসিদ্ধিকারীরা সাধারণত ছল-চাতুরিরই আশ্রয় নিয়ে থাকে, [তারা কেবল ধোঁকাই দিয়ে থাকে], কারণ পরিশেষে তাদেরকে চরম ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়। ইসলামে পুণ্যবান লোক কেবল তারাই অতিবাহিত হয়েছেন, যারা ধর্মের মোকাবিলায় জগতের প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপই করেননি। তিনি (আ.) বলেন, ভারতবর্ষে খোদার আউলিয়া কুতুব উদ্দীন এবং মঈন উদ্দীন অতিবাহিত হয়েছেন। তাঁরা নির্জনে খোদার ইবাদত করেছেন, কিন্তু খোদা তাঁদের সম্মান (সর্বসমক্ষে) প্রকাশ করে দিয়েছেন।

অতঃপর তিনি (আ.) একটি ঘটনার কথা বর্ণনা করে বলেন, আমরা বাটালায় একজন পীরযাদাকে দেখেছি, যে নিজের জমির মামলা-মোকদ্দমার জন্য ধুলোমলিন বদনে কোনো এক ডেপুটি কমিশনারের পেছনে পেছনে ঘুরত। [সে নিজের মামলা-মোকদ্দমার জন্য অথবা ধন-সম্পদ লাভের আশায় একজন অফিসারের, অর্থাৎ সরকারি কর্মকর্তা বা ডেপুটির] পেছনে পেছনে ছুটতো]। তিনি (আ.) বলেন, (এতে) আমি খুবই আশ্চর্য হই, এই ব্যক্তির মাঝে যদি সত্যিকার পুণ্য থাকত– (এরা এখন নিজেদেরকে পীরযাদা বলে দাবি করে, আমরা পীরদের সন্তান)। এবং সে খোদাতে নির্ভরকারী হতো, তাহলে সে এমন নোংরামি ও কলুষতাপূর্ণ বিষয়ে কেন জড়াতো? পৃথিবীতে যত পাপ দেখা যায়, এর কারণ হলো, পার্থিব আনন্দ, জগতের সম্মান এবং জাগতিক ধন-সম্পদের প্রতি মানুষের যতটা আস্থা রয়েছে, পরকাল সম্পর্কে ততটা বিশ্বাস নেই। এ কারণেই মানুষ পাপ করে। মূল্যবান মণিমুক্তা ও খাঁটি স্বর্ণে পরিপূর্ণ এবং নিজের আয়ত্তে থাকা একটি সিন্দুকের ওপর মানুষ যেভাবে ভরসা করে, তদ্রূপ ভরসা সে খোদার ওপর করে না। জাগতিক সরকার এবং পার্থিব শাসকদের মানুষ যেভাবে ভয় করে এবং তোষামোদ, অর্থাৎ চাটুকারিতার মাঝে জীবন কাটায়, সেভাবে তারা খোদা তা'লাকে ভয় করে না। এর কারণ কী? এর কারণ হলো, পার্থিব উপায়-উপকরণ, [বাহ্যিক ও বৈষয়িক উপায়-উপকরণ রয়েছে] যা তাদের সামনে রয়েছে সেগুলো তাদের দৃষ্টিতে এতটাই সুনিশ্চিত যে, এর সামনে ধর্মীয় বিশ্বাস কোনো মূল্যই রাখে না। পার্থিব উপকরণগুলোতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ আর ধর্মীয় বিশ্বাস ও খোদা তা'লার প্রতি ঈমানের কোনো মূল্য নেই। কাজেই, খোদা তা'লার ওপর যখন কোনো তাওয়াক্কুল (খোদা ভরসা) বা ভরসা-ই নেই এবং ধর্মকে জগতের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার কোনো চিন্তাই নেই, [যা আমাদের প্রতিটি শপথনামায় পাঠ করি, এখন খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা হচ্ছে, সেখানেও পাঠ করা হবে] তাহলে বিশ্বাস ও ঈমানের এই দুর্বলতা এমন মানুষকে পরকালের নিয়ামতরাজি থেকেও বঞ্চিত রাখবে। তারা এই জগৎকেই সবকিছু মনে করে বসেছে এবং একে পাওয়ার জন্যই চেষ্টা করতে থাকে। কেউ কেউ তা পেয়েছে আবার কেউ কেউ তা হস্তগত করার চেষ্টায় এই জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছে, [ব্যর্থ হয়েছে]। কিংবা হয়তো পেয়েছে কিন্তু এরপর তা নষ্ট হয়ে গেছে, আর এরপর তারা শাস্তির মাঝে, অর্থাৎ পার্থিব দিক থেকে চরম কষ্টের মাঝে জীবন কাটিয়েছে। তারা না রইল ধর্মের, আর না-ই জগতের। এ বিষয়ে এক কবি বলেছেন, **'নাহ্ খোদাহী মিলা নাহ্ ওয়াসালে সনম'** [খোদাকেও পেলো না আর প্রিয়তমের সান্নিধ্যও জুটল না– অনুবাদক]

মানুষকে খোদামুখী করা এবং পরকালে দৃষ্টিনিবদ্ধ করার বিষয়ে তাঁর (আ.) কীরূপ ব্যাকুলতা ও কতটা বেদনা ছিল এবং এজন্য তিনি কীভাবে দোয়া করতেন, তা বর্ণনা করতে গিয়ে খোদা তা'লাকে সম্বোধন করে তিনি (আ.) বলেন, **"দেখো! আমার প্রাণ পূর্ণ তাওয়াক্কুলের সাথে তোমার পানে এমনভাবে উড়ে যাচ্ছে, যেভাবে পাখি নিজ নীড়ের দিকে ফিরে আসে। কাজেই, আমি তোমার অলৌকিক ক্ষমতার নিদর্শন প্রত্যাশী, কিন্তু নিজের জন্য নয় এবং নিজের সম্মানের জন্যও নয়। বরং যাতে লোকেরা তোমাকে চিনতে পারে এবং তোমার পবিত্র পথগুলো অবলম্বন করে; আর তুমি যাঁকে প্রেরণ করেছ, তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে তারা যেন হিদায়াত থেকে দূরে সরে না যায়। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমিই আমাকে প্রেরণ করেছ এবং আমার সমর্থনে বড়ো বড়ো নিদর্শন প্রদর্শন করেছ।"**

আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নাম রেখেছেন 'মুতাওয়াক্কিল' বা খোদার ওপর ভরসাকারী। তিনি (আ.) বলেন, "মসীহ্‌র অবতরণের একটি

লক্ষণ এটি লেখা রয়েছে যে, তিনি দু'জন ফেরেশ্তার ডানার ওপর নিজের দুই হাতের তালু রেখে অবতরণ করবেন। এটি একথার প্রতি ইঙ্গিত করে, তাঁর ডান ও বাম হাত– যা বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞান এবং অভ্যন্তরীণ জ্যোতি লাভের মাধ্যম– তা ঐশী দায়িত্বপ্রাপ্তদের অর্থাৎ ফেরেশতার তত্ত্বাবধানে হবে। বুদ্ধিভিত্তিক যে-সব জ্ঞান রয়েছে, অভ্যন্তরীণ যে-সব জ্যোতি রয়েছে, ধর্মীয় জ্ঞান বা প্রজ্ঞার যে-সব বিষয় রয়েছে, তা এর মাধ্যমে অর্জিত হবে, [অর্থাৎ তা ফেরেশতাদের সাহায্যে অর্জিত হবে]। দু'জন ফেরেশতার ডানার ওপর হাত রাখার অর্থ এটিই। তিনি কোনো বিদ্যালয়, বই-পুস্তক ও পীর-মাশায়েখদের কাছ থেকে নয়, বরং খোদা তা'লার কাছ থেকে ইলমে লাদুননী বা ঐশী জ্ঞান লাভ করবেন, অর্থাৎ তিনি এমন জ্ঞান লাভ করবেন যা সম্পূর্ণরূপে খোদা তা'লা শেখাবেন; আর তাঁর জীবন-জীবিকা ও অভিভাবকত্বের দায়িত্ব স্বয়ং খোদা গ্রহণ করবেন। যেমনটি বারাহীনে আহমদীয়ার উদাহরণ দিয়ে তিনি (আ.) বলেন, বিগত দশ বছর পূর্বেই তাতে এই অধম সম্পর্কে এই এলহামটি প্রকাশিত হয়েছে যে,

إِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا

অর্থাৎ, তুমি আমাদের চোখের সামনে আছো। আমরা তোমার নাম 'মুতাওয়াক্কিল' (আল্লাহ্‌র ওপর পূর্ণ নির্ভরশীল) রেখেছি এবং নিজের পক্ষ থেকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি। এ বিষয়টি অনেক হাদীস এবং পবিত্র কুরআন থেকে সাব্যস্ত যে, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহমুখী হয়ে যায় পূর্ণ খোদা ভরসার বৈশিষ্ট্য অর্জন করে নেয়, তখন ফেরেশতাদেরকে তার সেবক নিযুক্ত করা হয় এবং প্রত্যেক ফেরেশতা নিজ নিজ পদমর্যাদা অনুযায়ী তাঁর কাজে লেগে থাকে।

একদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি বৈঠকে বসেছিলেন। সেখানে তাওয়াক্কুল (বা আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা) প্রসঙ্গে কথা ওঠলে তিনি (আ.) বলেন, "আমি আমার হৃদয়ের এক অদ্ভুত অবস্থা অনুভব করি। যেভাবে প্রচণ্ড গুমোটভাব যখন বিরাজ করে এবং তাপমাত্রা তীব্র রূপ ধারণ করে, তখন মানুষ এই নিশ্চিত আশায় বুকবাধে যে, এবার নিশ্চয়ই বৃষ্টি হবে ঠিক তেমনই, যখন আমি আমার সিন্দুক খালি দেখি, *[অর্থাৎ দেখি যে, আমার কাছে কোনো টাকাপয়সা নেই]*, তখন খোদার করুণা ও কৃপায় আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, এবার এটি পূর্ণ হবে; আর বাস্তবে তদ্রূপই ঘটে।" খোদা তা'লার কসম খেয়ে তিনি (আ.) আরও বলেন, "যখন আমার থলি, অর্থাৎ পকেট বা ব্যাগ খালি থাকে, তখন খোদা তা'লার ওপর তাওয়াক্কুল (খোদা ভরসা) করার যে আধ্যাত্মিক স্বাদ ও আনন্দ আমি অনুভব করি, সেই অবস্থাটি ভাষায় বর্ণনা করা আমার জন্য সম্ভব নয়। যখন আমার কাছে কিছুই থাকে না, তখন আল্লাহ্ তা'লার ওপর আমার তাওয়াক্কুল আরও বেড়ে যায় আর এই অবস্থাটি অত্যন্ত প্রশান্তিকর ও স্বস্তিদায়ক হয়ে থাকে।"

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এই উক্তির ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে লেখেন যে, ওলীআউলিয়াদের টাকার থলি বা জেব প্রায় সময় খালিই থাকে, *অর্থাৎ পুণ্যবানরাা ধন-সম্পদ জমা করেন না। তাদের ধনভাণ্ডার সাধারণত শূন্যই থাকে, পকেটও খালি থাকে; তারা মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দেন।* কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তো তাওয়াক্কুলের অবস্থা লক্ষ্য করুন– একজন অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ কৃষক যেমন তার বহুবার পরীক্ষিত কূপ সম্পর্কে এই বিশ্বাস রাখে যে, যখন এর বর্তমান পানি শেষ হবার পর্যায়ে পৌঁছবে, তখন এর ভূগর্ভস্থ প্রস্রবণ অর্থাৎ ঝরনা আপনা-আপনিই খুলে যাবে এবং কূপটি আবার পানিতে পূর্ণ হয়ে যাবে। *কূপ খনন করার পর কখনো কখনো পানি তুলতে তুলতে তা শুকিয়ে যায়, কিন্তু তারপর ধীরে*

ধীরে আবার তাতে পানি জমতে শুরু করে। ঠিক তদ্রূপ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয় এই বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিল যে, একদিকে আমার পকেট খালি হবে আর অন্যদিকে ঊর্ধ্বলোকের অদৃশ্য হাত তা আবার পূর্ণ করে দেবে এবং আল্লাহ্ তা'লা যে কাজ আমার ওপর অর্পণ করেছেন, তাতে কোনো বাধা সৃষ্টি হবে না। এটিই সেই সাহায্য ও সমর্থন লাভের বিষয় যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে একেবারে প্রাথমিক যুগেই অবহিত করেছিলেন–أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ অর্থাৎ, 'আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?' প্রকৃত সত্য হলো, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ ঐশী প্রত্যাদেশ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ওপর রহমতের মেঘমালা হয়ে বিরাজ করে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র জীবনীতে তাওয়াক্কুলের বিষয়ে একটি ঘটনা পাওয়া যায়। 'বারাহীনে আহমদীয়া'-এর মুদ্রণ বিলম্বিত হবার প্রসঙ্গে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) কাপুরথলা রাজ্যের একজন সম্মানিত কর্মকর্তা হাজী মুহাম্মদ ওয়ালী সাহেবের নামে একটি চিঠিতে লেখেন যে, 'আপনার পূর্ববর্তী চিঠিতে এত বেশি রাগ ও তিক্ততা ছিল'–*অর্থাৎ তিনি চিঠি লিখেছিলেন যে, 'বারাহীনে আহমদীয়া' প্রকাশে বিলম্ব হয়ে গেছে। তিনি বইটি প্রকাশের জন্য টাকা দিয়েছিলেন; কিন্তু বইটি যখন তার কাছে পৌঁছায়নি, তখন তিনি এমন চিঠি লিখেছিলেন।* হযরত আকদাস (আ.) পত্রের বরাত টেনে লিখলেন, 'আপনার যে চিঠিটি আমার হস্তগত হয়েছে তাতে এত বেশি ক্রোধ ও তিক্ততা এবং এমন কঠোর ও অমার্জিত শব্দ ছিল, যা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিল যে, আপনার কুধারণা চরম মাত্রার অনর্থ ও বিশৃঙ্খলায় উপনীত হয়েছে।' পত্র থেকে প্রতিভাত হচ্ছিল তিনি অত্যন্ত রাগ করে চিঠি লিখেছিলেন এবং সেই রাগ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। তিনি (আ.) বলেন, 'যদি এই গ্রন্থের ক্রয়-বিক্রয়ের সম্পর্ক না থাকত, তাহলে কখনোই আশা করা যেত না যে, আপনার কলম থেকে এমন শব্দ বের হতে পারে।' *আপনি টাকা দিয়েছিলেন, তাই বিলম্ব হওয়ায় এমন কঠোর শব্দ লিখেছিলেন; আপনি ধৈর্য ধরতে পারেননি।* সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, এমন দুর্ভাগ্যজনক সম্পর্ক আপনার মতো একজন সম্মানিত ব্যক্তির স্বভাবকে অস্থির করে তুলেছে, আর এখনও জানা নেই যে, এই অন্তরের অস্থিরতা ও অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা কোথায় গিয়ে ঠেকবে এবং কতদূর গড়াবে। এই অধমের অবস্থা হলো, এই সমস্ত কার্যক্রম কেবল মহাসম্মানিত নামের অধিকারী আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে চলছে *; ইনশাআল্লাহ্ তা সম্পন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু পথে কিছু বাধা আসে; এগুলো দূর করার মতো কোনো শক্তি আমার নেই। কিন্তু আপনি যে পরিমাণ অধৈর্য প্রকাশ করছেন তা উচিত নয়।* যাহোক, এমতাবস্থায় ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি বাতিল করে দেওয়া এবং প্রেরিত মূল্য ফেরত নেওয়া আপনার জন্য যুক্তিযুক্ত হবে।' *আপনার যদি এত দুশ্চিন্তা থাকে এবং আপনার মনে এই ধারণা থাকে যে আমি আপনার টাকা আত্মসাৎ করে ফেলেছি তাহলে আপনার মনকে শান্ত ও আশ্বস্ত করা দরকার; কারণ আপনি যদি আপনার টাকা ফেরত নিয়ে নেন, তাহলে সম্ভবত আপনার মন ঠান্ডা হবে, রাগ উবে যাবে।* এই সমস্ত উত্তেজনার এছাড়া আর কোনো কারণ দেখা যা না, কয়েক টাকা হাতছাড়া হওয়া আপনার হৃদয়কে অস্থিরতা, আক্ষেপ, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মুখে ঠেলে দিয়েছে অথচ তা একদিন হাতছাড়া হবার ছিলই। তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকে এই চিঠি পাঠানো হচ্ছে যে, যদি এই কঠোর ও অশালীন শব্দগুলোর কারণ সেটিই হয়, যা আমি বুঝেছি, তাহলে আপনি আমাকে মূল্য ফেরত দেওয়ার জন্য জানিয়ে দিন, যাতে আপনার প্রেরিত মূল্য ফেরত দিয়ে সেই চিকিৎসা করা যায়, যার মাধ্যমে আপনি যেভাবে কথা বলছেন তা বন্ধ করে

মুমিনসুলভ বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করেন অর্থাৎ জিহ্বা সংযত করেন তাহলে আমি আপনাকে টাকা ফেরত দিচ্ছি; মু'মিনের বৈশিষ্ট্যতো এটাই যে সে এধরণে কথা বলে না। আর তিনি (আ.) বলেন, 'আপনি যদি "সুরমা চাশমায়ে আরিয়া" পুস্তিকাটি দেখতেন, তাহলে জানতে পারতেন যে, আমি আগেই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে রেখেছি যে, কেউ যদি "বারাহীনে আহমদীয়া" মুদ্রণে বিলম্বের কারণে অসন্তুষ্ট হন এবং মূল্য ফেরত নিতে চান, তাহলে তিনি যেন আমাকে জানিয়ে দেন; এমন সকল ক্রেতার মূল্য ফেরত দেওয়া হবে।' আমি আগেই ঘোষণা করে দিয়েছি যে, "সুরমা চাশমায়ে আরিয়া" গ্রন্থ আমি লিখছি এবং এর কারণে "বারাহীনে আহমদীয়া"-এর প্রকাশনা বিলম্বিত হতে পারে; অতএব কারও যদি তাড়াহুড়া থাকে এবং টাকা ফেরত নিতে চান, তাহলে তিনি তা নিয়ে নিতে পারেন। তিনি (আ.) বলেন, আপনি জেনে রাখুন, যারা কুধারণা করে এবং মুখ থেকে নোংরা কথা বের করে, তারা আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না; বরং তারা خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ-এর অর্থাৎ 'ইহকাল ও পরকাল উভয়টিই হারিয়েছে'-এর দৃষ্টান্তে পরিণত হয়। এই সমস্ত কার্যক্রম আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এবং তিনিই তা সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করবেন। আপনাদের টাকার আমার কোনো প্রয়োজন নেই। এটি আল্লাহ্ তা'লার কাজ; আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তিনি এটিকে পূর্ণ করে দেবেন। যদি সমগ্র মানবজাতি আজ আপনার মনে যে ধারণা সৃষ্টি হয়েছে, ঠিক তেমন ধারণা তাদের অন্তরে সৃষ্টি করে নেয়, তবুও তারা আমাদের সামান্যতম ক্ষতিও করতে পারবে না। আমাদের সেই পরম দয়ালু অভিভাবক রয়েছেন, যিনি অন্ধকার যুগে আমাদেরকে মনোনীত করেছেন; তিনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এবং তিনিই যথেষ্ট।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব এই চিঠি সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, এই পত্র থেকে আল্লাহ্ তা'লার ওপর তাঁর (আ.) তাওয়াক্কুলেরও পরিচয় পাওয়া যায় এবং এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লার ওহি তার (আ.) নাম 'মুতাওয়াক্কিল'ও রেখেছিল। মোটকথা, এই পত্রটি হযরত আকদাস (আ.)-এর পবিত্র জীবনের জন্য আয়নাস্বরূপ।

দোয়া ও তাওয়াক্কুল (খোদা ভরসা) সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একটি উক্তি হলো, 'সমস্ত জটিলতার সমাধান দোয়ার মাধ্যমে হয়ে যায়। আমাদের হাতে যদি কারও কল্যাণ কামনার জন্য কিছু থাকে, তাহলে কী আছে? শুধু দোয়ার অস্ত্রই রয়েছে যা আল্লাহ্ আমাদের দিয়েছেন। বন্ধুর জন্য হোক কিংবা শত্রুর জন্য, আমরা কালোকে সাদা এবং সাদাকে কালো করতে পারি না। আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে আমাদের যা দান করেন তাছাড়া আমাদের ক্ষমতার মধ্যে এক কণাও নেই। বিপদের সময় উৎকণ্ঠা দেখা দিয়ে থাকে কিন্তু কখনোই মানুষের তাওয়াক্কুল (খোদা ভরসা) হাতছাড়া করা উচিত নয়। এ ধরনের অস্থিরতা আসা মানবিক চরিত্র ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আবশ্যক; কিন্তু মানুষের উচিত হতাশাকে কাছে আসতে না দেওয়া।' অস্থিরতা তো হয়, উদ্বেগউৎকণ্ঠা থাকে যে কাজটি যেন দ্রুত সম্পন্ন হয়ে যাক; কিন্তু মানুষ আল্লাহ্ তা'লার ব্যাপারে হতাশ হয়ে যাবে এবং তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল (খোদা ভরসা) ছেড়ে দেবে–এটি হওয়া উচিত নয়। কারণ হতাশা তো কাফিরদের বৈশিষ্ট্য। মানুষের মনে বিভিন্ন ধরনের ভাবনা অস্থিরতার কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে, কিন্তু ঈমান সেই কুমন্ত্রণাগুলো দূর করে দেয়। মানবিক দুর্বলতা অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে, আর ঈমান তা দূর করে দেয়। *অর্থাৎ মানুষের স্বভাবগত কারণেই অস্থিরতা তো হয়, কিন্তু ঈমান যদি পূর্ণাঙ্গ হয়, তাহলে সেই অস্থিরতা দূর হয়ে যায়। তখন সাফল্যের বিষয়ে আস্থা জন্মে।*

মানবিক চাহিদা ও স্বভাবগত প্রবণতা থেকে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়, কিন্তু ঈমান যদি পরিপূর্ণ হয়, তাহলে তা দূর করে দেয়।

দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং আল্লাহ্ তা'লার ওপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) সৃষ্টি করার উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, 'আত্মসংশোধনের জন্য, শুভ পরিণতির জন্য এবং নেক কাজ করার তৌফিক লাভের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় দিকটি হলো দোয়া। এতে মানুষ যত বেশি আল্লাহ্ তা'লার ওপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) ও বিশ্বাস করবে এবং এই পথে ক্লান্তিহীন পদক্ষেপ রাখবে, ততই উত্তম ফলাফল ও ফল-ফসল লাভ করবে। সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এবং দোয়াকারী ব্যক্তি তাকওয়ার উচ্চ মানে পৌঁছে যাবে।'

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর তাওয়াক্কুলের দিকটি বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর জীবনীকার হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব লেখেন যে, যদিও তিনি (আ.) কোনো মামলার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে পূর্ণ পরিশ্রম ও চেষ্টা করতেন, কিন্তু কখনোই এসব উপায়ের ওপর ভরসা করতেন না; বরং দোয়ার ওপর নির্ভর করতেন এবং সবসময় আল্লাহ্ তা'লার সত্তাই তাঁর সামনে থাকত। তিনিই ছিলেন উপাস্য এবং কাম্য, আর তাঁর ওপরই ছিল তাওয়াক্কুল (ভরসা) ও নির্ভরতা।

ইতিহাসে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, একজন বৃদ্ধ হিন্দু, যিনি হযরত আকদাস (আ.)-এর পিতার বন্ধু ছিলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রত্যাদেশ পাওয়ার পর কাদিয়ানে আসেন এবং তাঁর অবস্থা ও তাওয়াক্কুলের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্মের সময়েরও আগের মানুষ এবং আমি তাঁকে কোলে নিয়েছে বা আমার কোঁলে তিনি খেলেছেন। যখন থেকে তিনি বুঝতে শিখেছেন তখন থেকেই অত্যন্ত নেক ছিলেন।' এই হিন্দু ব্যক্তি তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, 'তিনি জাগতিক কোনো কাজের সঙ্গে জড়িত হননি। শিশুদের মতো খেলাধুলায় মগ্ন হননি। দুষ্টুমি, অশান্তি, মিথ্যা, গালাগালি–কখনোই তাঁর মধ্যে ছিল না। আমি এবং আমার সমবয়সিরা তাঁকে অলস, সরল ও বোকা মনে করতাম এবং ভাবতাম, তিনি কীভাবে জীবন অতিবাহিত করবেন! তিনি তো আমার হাতেই বড়ো হয়েছেন।' হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে এই হিন্দু বলছেন, 'তিনি কীভাবে জীবনযাপন করবেন? আলাদা একটি ঘরে থাকা ছাড়া তাঁর আর কোনো কাজই ছিল না। কাউকে মারেননি, নিজেও মার খাননি।' এটিও তো যুবকদের একটি অভ্যাস হয়ে থাকে–মারামারি ও ঝগড়াঝাঁটি হয়; বাইরে যায়, মারেও, মার খায়ও; তারপর শক্তপোক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু তিনি এসবের কিছুই শেখেননি। তাহলে তিনি কী করবেন? *তিনি জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে*। তিনি কাউকে কখনো খারাপ বলেননি এবং নিজেও কারও মুখে খারাপ কথা শোনেননি। এক বিস্ময়কর পবিত্র জীবন ছিল তাঁর যদিও আমাদের দৃষ্টিতে তা উত্তম ছিল না।' অর্থাৎ ধর্মীয় দৃষ্টিতে দেখলে তা ছিল অত্যন্ত পবিত্র জীবন, কিন্তু আমাদের মত জগৎপূজারীদের দৃষ্টিতে সেই জীবনকে ভালো মনে করতাম না–এই হিন্দু এমনটাই বলছেন। 'কোথাও যাওয়া নেই, কোথাও আসা নেই; সাধারণ প্রয়োজইচ্ছাড়া কথাবার্তাও বলতেন না। আমরা কখনো কোনো কথা বললে– যেমন বলতাম, মিয়া, দুনিয়ায় কী হচ্ছে? তুমিও এগুলো উপভোগ করো; অন্তত খেলাধুলা ও আনন্দ-উৎসবের জন্যই বাইরে বের হও–তখন তিনি কিছু বলতেন না, হেঁসে চুপ করে থাকতেন। আমরা বলতাম, একটু বুদ্ধিমান হও, খাও, উপার্জন করো, কিছু একটা কাজ করো।' এসব শুনেও তিনি নীরব থাকতেন। তাঁর পিতা আমাকে বলতেন, 'নম্বরদার! যাও, গোলাম আহমদকে ডেকে আনো। তাকে কিছু বুঝিয়ে বলো।' আমি গিয়ে তাঁকে ডেকে আনতাম। পিতার আদেশ শুনে তিনি

সঙ্গে সঙ্গে চলে আসতেন, চুপচাপ বসে থাকতেন এবং দৃষ্টি নিচু করে রাখতেন। তাঁর পিতা বলতেন, 'বেটা গোলাম আহমদ, তোমাকে নিয়ে আমাদের অনেক চিন্তা ও আশঙ্কা হয়। তুমি কী করে খাবে? এভাবে আর কতদিন চলবে? কোনো আয়উপার্জন করো, আর কতদিন এভাবে অবিবাহিত হয়ে থাকবে? খাওয়া-পরার চিন্তা করা প্রয়োজন। দেখো, দুনিয়ার মানুষ আয় উপার্জন করছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে, কাজকর্ম করছে। তোমার বিয়ে হবে, স্ত্রী আসবে, সন্তান-সন্ততি হবে। তারা খাওয়া, পান করা ও পরিধানের জন্য তোমার কাছে চাইবে। তাদের দায়দায়িত্ব তোমার ওপর থাকবে। এই অবস্থায় তোমাকে বিয়ে করাতে ভয় হয়। একটু চিন্তা কর, এই উদাসীনতা ও সরলতা ছেড়ে দাও। আমি আর কয়দিন বাঁচবো। উচ্চপদস্থ ইংরেজ অফিসার ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সাথে আমার পরিচয় আছে, তারা আমাকে সম্মান করে। আমি তোমাকে চিঠি লিখে দিচ্ছি, তুমি প্রস্তুত হয়ে যাও, অথবা তুমি বললে আমি নিজে গিয়ে সুপারিশ করবো। তখন মির্যা গোলাম আহমদ কোন উত্তর দিতো না। তিনি অর্থাৎ, তাঁর পিতা মহোদয় বার বার এভাবেই বলতেন, শেষে কোন উত্তর দিলে এটি দিতেন, আব্বা!! আমি তাঁর চাকর যিনি অফিসারদের অফিসার, রাজাধিরাজ, *এবং সিদ্ধান্তকারীদের মাঝে সর্বোত্তম*। যে নিজ রাব্বুল আলামীন এর অনুগত; তার অন্য কারো চাকুরির কী দরকার? তবে আমি আপনার নির্দেশের বাহিরে নই। আপনি বলছেন, চাকুরি কর, আমি করবো। মির্যা গোলাম মর্তুজা সাহেব এই উত্তর শুনে নীরব হয়ে যেতেন এবং বলতেন, ঠিক আছে, পুত্র যাও নিজের নির্ভিত জগৎ শামলাও। এই হিন্দু ভদ্রলোক বলছেন যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সেখান থেকে চলে যেতেন, *তিনি তখন যুবক ছিলেন,* তখন তাঁর পিতা আমাদের বলতেন, আমার এই পুত্র মোল্লাই থাকবে। আমি তার জন্য কোন মসজিদই খুঁজে দিতে পারতাম হয়ত দশ বিশ মন শস্যই একত্রিত করে নিত। কিন্তু আমি কী করবো, এ তো মোল্লাগিরিরও যোগ্য নয়। আমার পর সে কীভাবে জীবন অতিবাহিত করবে। সে তো পুণ্যবান, কিন্তু এখন এমন মানুষের যুগ নেই, চালাক-চতুর লোকদের যুগ। এরপর অশ্রুসজল হয়ে পিতা মহোদয় বলতেন, গোলাম আহমদের পবিত্র জীবন আমরা লাভ করতে পারিনি? এই জগতের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই সে উর্ধ্বলোকের মানুষ। সে মানুষ নয় ফেরেশতা। এ কথা বলে, সে বৃদ্ধ হিন্দুও অশ্রুসজল হয়ে গেল। *যে ঘটনা শুনাচ্ছিল সে কাঁদতে লাগলো।* বলে এখন মির্যা গোলাম মর্তুজা যদি জীবিত থাকতেন, এই হিন্দু তাঁর বন্ধু ছিলেন, অনেক বয়োবৃদ্ধ। তিনি বলেন, অর্থাৎ, মসীহ মওউদ (আ.)-এর পিতা মির্যা গোলাম মর্তুজা যদি আজ জীবিত থাকতেন আর তাঁর এমর্মে বিদ্যমান উত্থান ও উন্নতি দেখতেন, যে জগতের বিজ্ঞ ও মৌলভীরা তাঁর দ্বারস্থ; আর খোদা তাঁকে সে মর্যাদা দিয়েছেন এবং নিজের শক্তির সে বিকাশ দেখিয়েছেন, যার সম্মুখে সকলের জ্ঞান ও বুদ্ধি তুচ্ছ। এখন এই হিন্দু স্বীকার করছেন যে, যদি তিনি আজ দেখতেন তাহলে তিনি জানতে পারতেন যে, এই ব্যক্তিই যিনি আল্লাহ্‌র প্রতি তাওয়াক্কুল (খোদা ভরসা) করেছিলেন এবং আল্লাহ্‌র খাতিরে সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন; আজ গোটা জগৎ তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করছে।

হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) লিখেন, একবার ঘটনাচক্রে আমার পঞ্চাশ টাকার প্রয়োজন দেখা দেয়। যেভাবে কখনো কখনো দরবেশ ও তাওয়াক্কুলকারীদের জীবনে এমন অবস্থা এসে থাকে, সে সময় আমার কাছে কিছু ছিল না। সুতরাং যখন আমি প্রাতঃভ্রমণে বের হলাম, এই প্রয়োজনের কথা আমার মনে এই স্পৃহা সৃষ্টি করলো যে, এই জঙ্গলে দোয়া করি। অতএব, আমি একটি গোপন স্থানে গিয়ে সেই খালের তীরে গিয়ে দোয়া করলাম যা কাদিয়ান থেকে তিন মাইল দূরত্বে বাটালার পথে অবস্থিত। আমার দোয়া শেষ

হতেই ইলহাম হলো যার অনুবাদ হলো,' লক্ষ কর! আমি কীভাবে তোমার দোয়া গ্রহণ করি। তখন আমি আনন্দিত হয়ে কাদিয়ান ফেরত আসলাম এবং পোস্ট অফিসে গিয়ে আজ আমার নামে কোন টাকা এসেছে কিনা তার খবরাখবর নেয়ার জন্য বাজারের দিকে গেলাম। *এটি দাবির পূর্বের ঘটনা।* আমি একটি চিঠি পেলাম যাতে লেখা ছিল, লুধিয়ানা থেকে কেউ পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়েছে এবং সম্ভবত সেই টাকা ওই দিনই অথবা পরের দিন আমি পেয়ে গেলাম।

দোয়ার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হতে পারে মর্মে মুসলমানদের বিশ্বাস তাদের দুর্বল করে দেয়- অর্থাৎ, দোয়ার মাধ্যমে সমস্যা দূর হয় এমন বিশ্বাস তাদেরকে কর্মবিমুখ করে তুলে এছাড়া এমন ব্যক্তিও রয়েছে যারা শুধুমাত্র দোয়ার দিকেই মনোযোগ দেয় এবং জাগতিক উপকরণ ব্যবহার করে না। আর এ কারণে তাদের অবস্থা দুর্বল হয়- একজন রইসের (জমিদার) এই ধারণার কথা জানতে পেরে তিনি (আ.) বলেন, "যে দোয়াকে অস্বীকার করে সে খোদাকে অস্বীকার করে। দোয়াই খোদাকে শনাক্ত করার একমাত্র মাধ্যম। আর এখন তাঁর কর্তৃত্ব স্বেচ্ছায় হোক বা অইচ্ছায় মেনে নেওয়ার সময় এসেছে। প্রকৃত বিষয় হলো, সর্বত্র নাস্তিকতা ছড়িয়ে পড়েছে। অধুনা সভা-সমাবেশের অবস্থা হলো দোয়া, তাওয়াক্কুল (খোদা ভরসা) এবং ইনশাআল্লাহ বলার কারণে বিদ্রুপ করা হয়। এই কথাগুলোকে নির্বুদ্ধিতা বলা হয়। *এই যুগে এই অবস্থা আরো ভয়ানক রূপ ধারণ করেছে।* নতুবা খোদা তা'লার প্রতি যদি তাদের সামান্যতমও অনুরাগ থাকত তাহলে তাঁর নাম নেওয়ার ফলে উত্তেজিত কেন হয়? যাকে যে ভালোবাসে প্রেমাষ্পদের নাম নেয়ার সুযোগ সন্ধান করে। যদি তাদের দৃষ্টিতে খোদা তা'লা নামে কিছুই না থাকে তাহলে এখন মৃত্যুর দ্বার উন্মুক্ত আছে, তা বন্ধ করে দেখাক। আশ্চর্যের বিষয় হলো, তাঁর সত্তার উপর আমাদের যতটুকু আশা-ভরসা রয়েছে ততটুকু অপরপক্ষ তাঁর বিষয়ে নিরাশ, *অর্থাৎ খোদার বিরোধী নাস্তিকদের কথা বলা হচ্ছে*। প্রকৃত বিষয় হলো, খোদা তা'লার অনুগ্রহ আবশ্যক। তিনি যদি হৃদয়ের তালা না খোলেন তবে আর কে খুলতে পারবে? তিনি যদি চান তবে তাঁর কথা বুঝার জন্য তিনি এক কুকুরকেও জ্ঞান-বুদ্ধি দান করতে পারেন আর মানুষকে বঞ্চিত রাখতে পারেন।"

হযরত মিয়াঁ আল্লাহ ইয়ার সাহেব ঠিকাদার বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাকে ডেকে বললেন, তোমার কাছে কি কিছু কাঠ আছে? আমি নিবেদন করি, হুযূর! কিছু কুল, বাবলা এবং পিঁপুল কাঠ আছে। হুযূর (আ.) বললেন, অতিথিশালার জন্য কিছু খাট তৈরির জন্য (কাঠ) প্রয়োজন। সেগুলোর পায়া তৈরি করতে হবে আর এর প্রয়োজন রয়েছে। আমি নিবেদন করলাম, পিঁপুল কাঠ দিয়ে তৈরি করে দিচ্ছি। এক ব্যক্তি বলে ওঠে, হুযূর! পিঁপুল কাঠ তো নষ্ট হয়ে যায়। এর পায়া দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তিনি (আ.) বললেন, যার জন্য বানানো হচ্ছে তিনি দরিদ্র নন, তিনি ঐশ্বর্যশালী অর্থাৎ আমরা আল্লাহ তা'লার খাতিরে তৈরি করছি, তাই ঠিক আছে। কিছু কাল তো চলবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এটি দিয়ে কাজ চলবে। তিনি (আ.) বললেন, প্রথম পোশাক নষ্ট হলে তিনিই নতুন তৈরি করে দেন। সেখানে চিন্তার কোনো কারণ নাই। তিনি আমাকে বিশটি খাট তৈরি করতে বলেন। আমাকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নির্দেশ দেন, বিশটি খাট তৈরি করে নিয়ে আসো। প্রত্যেক বস্তু কোনো না কোনো দিন তো নষ্ট হবেই, কিন্তু তিনি খোদার ওপর নির্ভর করে বললেন, আল্লাহ তা'লা হলেন দাতা , নষ্ট হয়ে গেলে তিনি পুনরায় ব্যবস্থা করে দেবেন। যাহোক এখন তো এই প্রয়োজন পূরণ কর। যাহোক তিনি বলেন, আমি বিশটি খাটের পায়ার আদেশ নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করার দ্বারপ্রান্তে ছিলাম এমন সময় এক কামারও সেখানে আসেন আর নিজের কষ্টের কথা উল্লেখ করেন যার তিনি অ-আহমদীদের পক্ষ থেকে সম্মুখীন হতেন। তিনি (কামার)

বলেন, গ্রামে আমাকে একা পেয়ে কষ্ট দেয়। দোয়া করুন যেন আল্লাহ তা'লা তাদের কঠোরতা থেকে রক্ষা করেন। তিনি (কামার সাহেব) বলেন, আমার নেহাই বা ভারী লোহার খণ্ড বা ব্লক ছিল যাতে লোহা গরম করে পেটানো হয় তা উঠিয়ে নিয়ে গেছে, চুরি করে নিয়ে গেছে। এখন আমি কাজ করতে পারছি না। এটি শুনে তিনি (আ.) তাকে বললেন, খোদার ওপর ভরসা রাখো, আল্লাহ তা'লা তোমার সাহায্যকারী হবেন। নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখো! যে খোদা তা'লার হয়ে যায় খোদা তা'লা তার হয়ে যান। যদি তোমার আহমদী হবার কারণে কষ্ট দেওয়া হয় তবে ইনশাআল্লাহ অভাব মোচন হবে, কষ্টসমূহ দূর হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ। প্রয়োজন নিবারণ হয়ে যাবে। খোদাকে যদি তুমি পরিত্যাগ না কর তবে তোমার দরকারি জিনিস তোমায় দান করবেন। আমিও দোয়া করব। যে বৈঠকে তিনি নিজের ক্ষেত্রে তাওয়াক্কুলের কথা বললেন সেখানেই অপর এক ব্যক্তিকেও তাওয়াক্কুল (খোদা ভরসা) ও দোয়ার উপদেশ প্রদান করেন।

তিনি নিজের একজন নিষ্ঠাবান দাসকে একটি নসীহত করেছিলেন, এর উল্লেখ হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) করেছেন। একটি রেওয়াতে ফয়যুল্লাহ চক-এর বাসিন্দা হাফেয নূর মুহাম্মদ সাহেব (রা.) লিখিতভাবে জানিয়েছেন, হাফেয হামেদ আলী সাহেব থেকে আমি এই কথাটি শুনেছি। হযরত আকদাস (আ.) বলেছেন, যদি কখনো কোন বিষয়ে অথবা কোন কারণে কোন কর্মকর্তা বা বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হতে হয়, তাহলে যাওয়ার পূর্বে সাতবার সূরা ফাতিহা পাঠ করা উচিত, আর সাত বার নিজ আঙুল দ্বারা নিজের কপালে 'ইয়া আযিযু' লিখে নেওয়া উচিত। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা সফলতা দান করেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেন, সম্ভবত "হালাতে ইসতেগনা আ'ন গাইরিল্লাহ", অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য সবার প্রতি অমুখাপেক্ষিতা এবং আল্লাহ তা'লার ওপর তাওয়াক্কুলের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করার জন্যই তিনি একথা বলে থাকবেন; অর্থাৎ এভাবে যদি দোয়া কর আর মনোযোগ নিবদ্ধ কর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তোমার মনোযোগ নিবদ্ধ হবে এবং গায়রুল্লাহ্র ভয় দূর হয়ে যাবে আর ইনশাআল্লাহ্ আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহও করবেন।

মামলা-মোকাদ্দমাসমূহের রায়ের ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আমার নীতি হলো, সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তিও যদি মামলা-মোকাদ্দমা করে, তাহলে তাতেও আল্লাহ্র হস্তক্ষেপ থাকে এবং খোদা তা'লা যা চান, তার মাধ্যমে সেই ফয়সালা করান বা রায় লিখিয়ে নেন। মানুষের ওপর ভরসা করা শিরক; বরং কোনো নেকড়ের কাছেও যদি মামলা যায়, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তাকেও বোধবুদ্ধি দান করবেন।"

তাঁর (আ.) বিরুদ্ধে অগণিত মামলা-মোকদ্দমা করা হয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ওপর তাঁর এত দৃঢ়বিশ্বাস ও তাওয়াক্কুল ছিল যে, এমন কোনো ঘটনা কখনোই ঘটে নি যে শত্রু বিজয়ী হবে; আর শত্রু কখনো সফল বা বিজয়ী হতে পারে- তাঁর আদৌ এই বিশ্বাস ছিল না।

এ ধরনের একটি ঘটনা সম্পর্কে হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব সিয়ালকোটী (রা.) বর্ণনা করেন, আমার ভালোভাবে স্মরণ আছে, যেদিন ডিস্ট্রিক্ট সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব কাদিয়ানে হযরত (মসীহ মওউদ) (আ.)-এর ঘর তল্লাশি করার জন্য এসেছিলেন এবং এর আগে এর কোনো সংবাদ জানা যায় নি আর জানা সম্ভবও ছিল না। সেদিন সকালবেলা কোনভাবে আমাদের মীর সাহেব, অর্থাৎ মীর নাসের নবাব সাহেব শুনেছিলেন যে, আজ গ্রেপ্তারি পরোয়ানাসহ পুলিস আসবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গ্রেপ্তার করার জন্য।

মীর সাহেব হতভম্ব ও যারপরনাই ভীতত্রস্ত অবস্থায় হযরত (মসীহ মওউদ) (আ.)-কে এ সংবাদ দেবার জন্য ভেতরে ছুটে যান এবং আবেগের আতিসয্যে অনেক কষ্টে এই অপ্রীতিকর সংবাদ সম্পর্কে অবহিত করেন। *তিনি অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন যে, ওয়ারেন্ট বা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে আসছে এবং তাঁকে (আ.) হাতকড়া লাগাবে।* তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) 'নূরুল কুরআন' (পুস্তক) লিখছিলেন। তখন তাঁর সামনে ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর একটি বিষয়। তিনি (আ.) মাথা তুলে মুচকি হেঁসে বলেন, 'মীর সাহেব! মানুষ জাগতিক আনন্দে রৌপ্য ও স্বর্ণের কঙ্কন পরে থাকে; আমরা মনে করব যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার পথে লোহার কঙ্কন পরে নিয়েছি।', *আল্লাহ্ তা'লার ওপর অগাধ ভরসা ভরসা ছিল তাঁর;* এরপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলেন 'কিন্তু এমনটি হবে না, কেননা খোদা তা'লার নিজের শাসন বা রাজ্য পরিচালনার কিছু রীতি আছে তিনি তাঁর খলীফা এবং প্রত্যাদিষ্টদের এভাবে অপমানিত হওয়া পছন্দ করেন না।'

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, মৌলভী সারওয়ার শাহ সাহেব (রা.) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, যে দিনগুলোতে গুরদাসপুরে করম দীনের সঙ্গে মামলা চলছিল এবং ম্যাজিস্ট্রেট তারিখ দিয়ে রেখেছিল। তখন হযরত সাহেব (আ.) কাদিয়ানে চলে এসেছিলেন। হুযূর নির্ধারিত তারিখের দুই দিন পূর্বে আমাকে গুরুদাসপুর পাঠান, যাতে আমি সেখানে গিয়ে কিছু উদ্ধৃতি বের করে প্রস্তুত করে রাখি; কেননা, পরবর্তী শুনানিতে উদ্ধৃতিগুলো উপস্থাপন করার কথা ছিল। তিনি বলেন, আমরা যখন গুরুদাসপুরের বাড়িতে পৌঁছি, তখন নিচ থেকে ডাক্তার মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব মরহুমকে ডাক দেই। *তাঁর বাড়িতে যাই, তিনি দরজা খুলে দিয়েছিলেন।* তিনি বলেন, আমাদের ডাক শুনে ডাক্তার সাহেব অস্থির হয়ে অঝোরে কাঁদতে শুরু করেন। কিছুক্ষণ পর চোখের পানি মুছতে মুছতে নিচে আসেন এবং বলেন, আমার কাছে মুহাম্মদ হোসেন মুনশি এসেছিল; *সে কাচারির মুনশি বা ক্লার্ক। সে আমাদের জামা'তের বিরোধী হলেও*, আমাকে এই কথা জানিয়েছে যে, আজ আর্যদের একটি জলসা হয়েছিল। আমাকেও একজন আর্য বন্ধু সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। জলসা বা সভার কার্যক্রম শেষে তারা ঘোষণা করে, সবাই চলে যাও, আমাদের প্রাইভেট সভা হবে। তিনি বলেন, আমি সেই বন্ধুর সঙ্গে ছিলাম। সে বলল, তুমি এক কোণে বসে থাকো, আমরা একসঙ্গে ফেরত যাব। যাহোক মুহাম্মদ হোসেন বলে, যখন তাদের প্রাইভেট মিটিং শুরু হলো, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে মির্যা সাহেবের নাম নিয়ে বলে, এই লোক আমাদের পরম শত্রু এবং আমাদের নেতা লেখরামের হত্যাকারী। এখন সে আপনার হাতের মুঠোয় আর পুরো জাতি আপনার পথপানে চেয়ে আছে। আপনি যদি এই শিকারকে হাতছাড়া হতে দেন, তবে আপনি জাতির শত্রু বলে গণ্য হবেন।–এই ধরনের নানা উসকানিমূলক কথা সে বলেছিল। এতে বিচারক উত্তর দিল, আমার তো আগেই ইচ্ছা ছিল, সম্ভব হলে শুধু মির্যা নয় বরং এই মামলার সাথে জড়িত তার সমস্ত সঙ্গী ও সাক্ষীকে জাহান্নামে পাঠাব! কিন্তু কী করব! মামলাটি এমন বিচক্ষণতার সাথে লড়া হচ্ছে যে ফাঁকফোকর খোঁজার কোনো সুযোগই পাওয়া যাচ্ছে না। তবে এখন আমি অঙ্গীকার করছি যে যা-ই ঘটুক না কেন, এই প্রথম হাজিরাতেই কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করব। মুহাম্মদ হুসাইন আমাকে বলে তুমি জাননা আইনি ব্যবস্থার অর্থ কী? এর মানে হলো, যেকোনো বিচারকের মামলার শুরুতেই বা মামলা চলাকালীন যেকোনো সময় জামিন নাকচ করে আসামিকে গ্রেপ্তার করে হাজতে পাঠিয়ে দেওয়ার অধিকার থাকে। সুতরাং এই খবর পৌঁছে দেওয়ার পর সে বলল, ডাক্তার সাহেব, আমি আপনাকে এই খবর পৌঁছে দিলাম। আপনি কোন বিহিত করুন। আমার মনে হয় এর দু'টি উপায় হতে

পারে। সে আদালতে কাজ করত, সে আইনি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরামর্শ দিল–প্রথমত, চিফ কোর্টে আবেদন করে এখান থেকে মামলাটি স্থানান্তরের চেষ্টা করা উচিত; আর দ্বিতীয়ত, মির্যা সাহেব যেন আগামী হাজিরায় কোনভাবে আদালতে উপস্থিত না হন এবং একটি মেডিকেল সার্টিফিকেট জমা দিয়ে দেন। তিনি বলেন, আমরাও ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম যে এখনই কাদিয়ানে লোক পাঠিয়ে হযরত সাহেবকে সংবাদটি জানানো দরকার। তখন রাত নেমে এসেছিল, কোনো যানবাহন পাওয়া যাচ্ছিল না। আমরা দুই-তিনজন মিলে পায়ে হেঁটে কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ফজরের নামাযের সময় কাদিয়ান পৌঁছালাম আর হযরত সাহেবের সকাসে সংক্ষেপে ঘটনাটি নিবেদন করলাম। কিন্তু হযরত মসীহে মওউদ (আ.) অত্যন্ত নির্ভারভাবে বললেন, আমরা বাটলায় যাবো। খাজা সাহেব এবং মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব লাহোর থেকে ফেরার পথে সেখানে আমাদের সাথে দেখা করবেন। তাঁদের সাথেও বিষয়টি নিয়ে কথা হবে এবং বোঝা যাবে মামলা স্থানান্তরের প্রচেষ্টার কী ফল হলো। তাঁরা এ কাজের জন্যই আগে গিয়েছিলেন। সুতরাং সেদিনই তিনি বাটলায় চলে এলেন। ট্রেনে মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব ও খাজা সাহেবের সাথে দেখা হলো। তাঁরা খবর দিলেন যে মামলা স্থানান্তরের চেষ্টা সফল হয়নি। এ কথা শুনে হযরত মসীহে মওউদ (আ.) ফিরে না গিয়ে সরাসরি গুরুদাসপুর চলে গেলেন। পথিমধ্যে তিনি খাজা সাহেব ও মৌলভী সাহেবকে বিচারকের পক্ষ থেকে আসা সংবাদের বিষয়ে কিছুই জানাননি–কোনো উল্লেখই করেননি। যখন তিনি গুরুদাসপুরের বাড়িতে পৌঁছালেন, তখন রীতি অনুসারে একটি পৃথক কক্ষে খাটে শুয়ে পড়লেন। অথচ তখন আতঙ্কে আমাদের গা কাঁটা দিয়ে উঠছিল যে এখন না জানি কী হয়! কিছুক্ষণ পর তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি গেলে দেখলাম হযরত সাহেব দুই হাতের তালু জড়ো করে মাথার নিচে রেখে সোজা শুয়ে আছেন। আমি যেতেই তিনি কনুইয়ে ভর দিয়ে তালুতে মাথা রেখে একপাশে কাত হলেন এবং আমাকে বললেন, আমি আপনাকে এজন্যই ডেকেছি, যাতে বিচারকের বলা সেই পুরো ঘটনাটি শুনতে পারি। আমি সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম যে তিনি এভাবে এ কথা বলেছেন। তিনি নীরবে শুনছিলেন। তিনি বলেন, যখন আমি 'শিকার' শব্দটিতে পৌঁছালাম–অর্থাৎ বিচারক বলেছিল, আমার হাতে শিকার এসেছে –অমনি হযরত সাহেব হঠাৎ করে উঠে বসে গেলেন! তাঁর চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল, মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল এবং তিনি বললেন, আমি তার শিকার?! আমি শিকার নই, আমি সিংহ–আর তা-ও আবার আল্লাহর সিংহ! সে কি আল্লাহর সিংহের গায়ে হাত তোলার দুঃসাহস দেখাতে পারে? পারলে করে দেখুক! এই কথাগুলো বলার সময় তাঁর কণ্ঠস্বর এত উঁচু হয়ে যায় যে ঘরের বাইরের সব মানুষ চমকে উঠে আর আশ্চর্য হয়ে এদিক-সেদিক তাকাল, তবে কেউ ভেতরে আসেনি। তিনি বারবার 'আল্লাহর সিংহ' শব্দটি পুনরাবৃত্তি করলেন। সে সময় তাঁর চোখ দুটি– যা সচরাচর নিচু ও অর্ধনিমীলিত থাকত–সত্যিই সিংহের চোখের মতো উন্মুক্ত হয়ে আগুনের শিখার মতো জ্বলজ্বল করছিল, আর চেহারা এত রক্তিম হয়ে উঠেছিল যে সেদিকে তাকাতেই ভয় হচ্ছিল। এরপর তিনি বললেন, আমি কী করব? আমি তো আল্লাহর কাছে এই আর্জি পেশ করেছিলাম যে, আমি তোমার ধর্মের খাতিরে নিজের হাত-পায়ে লোহা পরতে প্রস্তুত আছি (অর্থাৎ হাতকড়া পরতে রাজি আছি)'। কিন্তু তিনি (আল্লাহ) বলছেন, না, আমি তোমাকে লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করব এবং সম্মানের সাথে বেকসুর খালাস করব। তারপর তিনি আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সম্পর্কে বক্তব্য দিতে শুরু করলেন এবং প্রায় আধঘণ্টা ধরে গভীর উচ্ছ্বসিত আবেগে বক্তৃতা করতে থাকেন। যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে এই আশ্বাস তাঁর ছিল, তাই

তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ও তাওয়াক্কুল ছিল যে, বিচারক যা-ই বলুক না কেন বা যা-ই ঘটুক না কেন, সে কখনোই তাঁর ওপর হাত দিতে পারবে না।

হযরত মুসলেহে মওউদ (রা.) এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে লেখেন যে, ঈমানের শক্তি অত্যন্ত জোরালো হয়ে থাকে। এটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবনের ঘটনা। হযরত মুসলেহে মওউদ বলেন, আমি গুরুদাসপুরে থাকলেও যে বৈঠকে এই ঘটনা ঘটেছিল সেখানে ছিলাম না; এক বন্ধু আমাকে ঘটনাটি জানান। তিনি খাজা কামাল উদ্দিনের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, হয়তো পরে খাজা কামাল উদ্দিন সাহেবকে ডেকে নেওয়া হয়েছিল। খাজা কামাল উদ্দিন সাহেব ও অন্য আহ্‌মদীরা অত্যন্ত শঙ্কিত ছিলেন যে অমুক বিচারকের আদালতে মামলা চলছে, আর আর্য সমাজের লোকেরা তাঁর ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে মির্যা সাহেব আমাদের ধর্মের বিরোধী, তাঁকে সাজা দিন–এটাই হবে আপনার জাতীয় সেবা। বিচারকও এতে সায় দিয়ে বলেছিল, ঠিক আছে, আমি অবশ্যই সাজা দেব, এখন সে আমার হাতের মুঠোয় এসেছে। হযরত মসীয় মওউদ (আ.) এ কথা শুনে একপাশে কনুইয়ে ভর দিয়ে কাত হয়ে বললেন, খাজা সাহেব! আল্লাহর সিংহের ওপর কি কেউ হাত তুলতে পারে?

হযরত মুসলেহে মওউদ এর সাথে একথা যোগ করেন যে এর পরিণতিতে আল্লাহ তা'লা সেই বিচারককে এমন শাস্তি দেন –যে প্রথমত গুরুদাসপুর থেকে তার বদলি হয়ে যায়, এরপর তার পদে অবনতি ঘটে। অর্থাৎ কেবল তার পদোন্নতিই আটকায়নি, বরং তাকে নিচের পদে নামিয়ে দেওয়া হলো। সে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার বা এক্সট্রা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ছিল, তাকে সাধারণ মুনসেফ বা সাধারণ ম্যাজিস্ট্রেট বানিয়ে দেওয়া হলো। পরবর্তীতে অন্য এক বিচারক এসে রায় দিলেন, আর সেই রায় হযরত মসীহে মওউদ (আ.)-এর পক্ষেই যায়।

এই মামলার বিষয়েই চৌধুরী গোলাম সারওয়ার বাজওয়া সাহেব বর্ণনা করেন যে, হযরত মসীহে মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে যখন করম দীনের ফৌজদারি মামলা চলছিল, তখন একদিন অনেক আলেম ও আইনজীবী পরামর্শ করে হুযূরকে বললেন যে মামলাটি অন্য আদালতে স্থানান্তরের চেষ্টা করা উচিত। হুযূর জবাবে বললেন, সবকিছুর ভিত্তি জাগতিক উপায়-উপকরণের ওপর রেখো না, বরং আল্লাহর ওপর ভরসা করো।

করম দীন মামলার রায়ের দিন হুযূর (আ.)-এর তাওয়াক্কুলের মহিমা এভাবে প্রকাশ পায়। বাবু গোলাম মুহাম্মদ সাহেব (সানি) বর্ণনা করেন, আতমা রামের আগে চন্দু লালের আমলে হুযূর বলনে, এই লোকটা ভারী কুটিল ও কপট স্বভাবের; ওর পেটের খবর বোঝার উপায় নেই। সামনে এলে করজোড়ে দাঁড়ায় আর পরম কাকুতিমিনতি করে বলে–'হুযূর, আমার পদটাই এমন যে আমি আপনার চরণে লুটিয়ে পড়তে পারছি না'–অর্থাৎ পরম বিনয় দেখায়; অথচ সারাদিন বসিয়ে রেখে দিনশেষে বলে, কাল আসবেন। রোজ এমনই করে। এটি মানুষকে হয়রান করার কৌশল–বাইরে জোড়হাত করে বিনয় দেখাবে, আর কাজে করবে ঠিক উলটোটা!

যা-ই হোক, আতমা রামের আদালতে যখন রায় ঘোষণার সময় এল, তখন প্রচুর পুলিশ ডেকে আনা হলো, রাস্তাঘাটে জলসিঞ্চন করা হলো এবং পুরো আদালত প্রাঙ্গণ পুলিশ দিয়ে ঘিরে ফেলা হলো। এমন পরিস্থিতিতে খাজা সাহেব (খাজা কামাল উদ্দিন সাহেব) ধরে নিলেন বিচারক সাজা শুনিয়ে দেবে। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, হযরত সাহেব (আ.)-এর কাছে গিয়ে আমার এই বার্তা দিন যে, লোকটা তো ক্ষতি করতে আদা-জল খেয়ে লেগেছে বলে মনে হচ্ছে। হুযূর যদি অনুমতি দেন, তবে তিনজন উকিলকে ডেকে আনা যাক–লাহোর

থেকে মোহাম্মদ শাহ উকিল, ফজল দীন সাহেব আর তৃতীয়জন আমি নিজে। একজনকে ডিভিশনাল কোর্টে পাঠানো হোক, দ্বিতীয়জনকে সফররত গভর্নরের কাছে আর তৃতীয়জন হিসেবে আমি এখানে থাকি।

আমি যখন হুজুরের কাছে গিয়ে এই প্রস্তাবের কথা বললাম, তখন হযরত সাহেব হেঁসে ফেললেন। গ্রেফতারের ভয়ে এই সব পরিকল্পনা করা হচ্ছিল! হযরত মসীহে মওউদ (আ.) বললেন, কাশ্মীরি মানুষ মনোবল হারিয়ে বসেছেন। তিনি বললেন, গিয়ে ওদের বলো, এতদিন তো আমরা আপনাদের আইনি পরামর্শ মেনে চলেছি; যে আইনি পরামর্শ দিয়েছেন তা মেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন সব আল্লাহর ওপর ছেড়ে দাও। এখন আমার ভরসা আল্লাহর ওপর, তোমার ওপর নয়। আমি গিয়ে ঠিক তা-ই জানিয়ে দিলাম। খাজা সাহেব মন খারাপ করে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

আল্লাহর ওপর নির্ভর করার বিস্ময়কর মহিমা, যা আমরা তাঁর মনিবের অনুসরণে সর্বত্র দেখতে পাই! আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও তাওয়াক্কুলের সর্বোচ্চ মান অর্জন করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)